আল্লাহর দেওয়া নাম গ্রহণ করুন জাহিলিয়াতের ডাককে না বলুন



মুহাম্মাদ মিক্বদাদ

আল-কায়েদা উপমহাদেশের একজন মুজাহিদ

النصر
AN-NASR

আন-নাসর মিডিয়া

সেপ্টেম্বর ২০১৭

আল্লাহর দেওয়া নাম গ্রহণ করুন; জাহিলিয়াতের ডাককে না বলুন!

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানবজাতিকে শুধু সৃষ্টিই করে তাদেরকে বিবেক দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে রাসূলদের এবং সাথে সাথে তাঁদের কাছে আসমানি বিধান পাঠিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত নবী-রাসূলদের সর্দার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর, যিনি মানবজাতিকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন – এক সত্যের অনুসারী মুসলমান জাতি আর অন্যটি হল সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী কাফের জাতি। মহান আল্লাহ বলেনঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

"সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবীদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন।"[1]

একইভাবে, হাদিসে এসেছেঃ

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ

"মুহাম্মাদ (ﷺ) হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যকারী।"[2]

বলাই বাহুল্য, মানবজাতির এই বিভক্তির ফলে সৃষ্ট জাতিগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে মনোনীত জাতি হল মুসলিম জাতি। শয়তান ও তার দোসরদের প্রচেষ্টা হল এই বিভক্তিকে মুছে ফেলে মুসলিম জাতিসত্তাকে বিলুপ্ত করা, তাদের টুকরো টুকরো করে দেওয়ার জন্য নতুন নতুন জাতিসত্ত্বার উদ্ভব ঘটানো এবং উম্মতে মুসলিমকে শত শত ভাগে বিভক্ত করা। এজন্যই মুসলিম উম্মতকে বিভক্তকারী এরকম সকল ডাক ও জাতিসত্তাকে প্রত্যাখান করে, সেগুলোকে জাহিলিয়াতের ডাক বা অজ্ঞতার ডাক হিসেবে অভিহিত করে, আল্লাহর দেওয়া পরিচয়কেই সবার উপরে রাখার নির্দেশ দিয়ে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

وَمَنْ دَعَا دَعْوَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ " , قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: " نَعَمْ , وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى , فَادْعُوا بِدَعْوَةِ اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَبَادَ اللهِ "

"যে জাহিলিয়াতের ডাককে গ্রহণ করবে, তাকে বুকের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে? তিনি (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ, যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে। কাজেই, তোমরা আল্লাহর দেওয়া সেসব নামগুলোকে গ্রহণ কর, যেগুলোর মাধ্যমে তিনি তোমাদের মুসলিম, মুমিন এবং আল্লাহর বান্দা বলে ডেকেছেন।"[3]

একইভাবে অন্য এক হাদিসে রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ

"যে মুখে চাপড় দেয়, কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহিলিয়াতের ডাককে গ্রহণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[4]

রাসূল (ﷺ) এর এই শিক্ষা এবং বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মতের আঞ্চলিকতার নামে শত বিভক্তির বিপরীত চিত্র সামনে রেখে, ব্যথিত হৃদয়ের কিছু চিন্তা ভাবনা থেকেই এই প্রবন্ধটি লেখা। বিশেষভাবে বর্তমান সময়ে যখন আরাকানে মুসলিম উম্মতের উপরে নির্বিচারে গণহত্যা ও নির্যাতন হচ্ছে ... তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করা হচ্ছে ... মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানী হচ্ছে ... আর মাথাগোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য মাজলুম মুসলিম এই ভাইয়েরা বাংলাদেশ বা মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য যাওয়ার চেষ্টা করছে ... তখন বাংলাদেশ বা মালয়েশিয়ার মুসলিম ভাইয়েরা জাহিলিয়াতের পরিচয়কে গ্রহণ করে নিজেদের প্রকৃত জাতিসত্তাকে ভুলে যাচ্ছে ... নিজেদের বাংলাদেশী বা মালয়েশিয়ান বলে আর নিজ জাতির এই লোকদের রোহিঙ্গা বা বার্মি মানুষ বলে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

[1] সূরা আল-বাক্বারাহঃ ২১৩

[2] সহীহ বুখারী

[3] সুনানে নাসাঈ, বায়হাক্বী

[4] বুখারী ও মুসলিম

একদিকে এই পরিস্থিতি আর অন্যদিকে একজন মুসলিম হিসেবে তাদের কি দায়িত্ব ছিল তার এক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার জন্য আমার এই নগণ্য প্রচেষ্টা। আল্লাহর শাহী দরবারে দরখাস্ত - তিনি যেন মুসলিম উম্মতের অধিকার রক্ষার জন্য আমার এই চেষ্টাকে নিজ অনুগ্রহে কবুল করেন, আমাদের সব মুসলিমদের মনে সম্প্রীতি দান করেন আর মুসলিম উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

জাহিলিয়াতের ডাক বা পরিচয় কি

জাহিলিয়াতের ডাক বা জাহিলিয়াতের পরিচয় কি তা বোঝার জন্য কয়েকটি হাদিস উপস্থাপন করছি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ : أَخْبَرَنَا وقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا ، سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : يَا لَلأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিতঃ আমরা নবী (ﷺ) এর সাথে একটি গাযওয়া (সামরিক অভিযান) এ ছিলাম। এমন সময় মুহাজির এক ব্যক্তি আনসার এক ব্যক্তিকে পিছন থেকে আঘাত করল। তখন আনসার ব্যক্তিটি ডাক দিয়ে উঠলঃ হে আনসারেরা! মুহাজির ব্যক্তিটিও বলে উঠলঃ হে মুহাজিরেরা! রাসূল (ﷺ) এ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে এসে বললেনঃ জাহিলিয়াতের ডাক দেওয়ার কি হল? সাহাবীরা (রা) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুহাজির এক ব্যক্তি আনসার এক ব্যক্তিকে পিছন থেকে আঘাত করেছিল। তখন তিনি (ﷺ) বললেনঃ এই ডাক (অর্থাৎ আনসার ও মুহাজির নামে মুসলমানদের বিভক্তিকারী এই ডাক) ছেড়ে দাও। কারণ, এটা দুর্গন্ধযুক্ত।[5]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اقْتَتَلَ غُلاَمَانِ غُلاَمٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ ، يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَنَادَى الأَنْصَارِيُّ يَا لَلأَنْصَارِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوا : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلاَّ أَنَّ غُلاَمَيْنِ اقْتَتَلاَ فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، قَالَ : فَلاَ بَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا ، أَوْ مَظْلُومًا ، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ

জাবির (রা) থেকে বর্ণিতঃ দুইটি ছেলে পরস্পর লড়াই করছিল, একজন ছিল মুহাজির আরেকজন ছিল আনসার, তখন মুহাজির ছেলেটি ডাক দিয়ে উঠল হে মুহাজিরেরা আর আনসার ছেলেটা ডাক দিয়ে উঠল হে আনসারেরা। ফলে রাসূল (ﷺ) বের হয়ে আসলেন এবং বললেনঃ কেন এই জাহিলিয়াতের ডাক? লোকেরা বললঃ না হে আল্লাহর রাসূল। ঘটনা এই যে, দুইটি ছেলে লড়াই করছিল, তখন একজন আরেকজনের পশ্চাতে আঘাত করে। একথা শুনে রাসূল (ﷺ) বললেনঃ সমস্যা নেই; মানুষের উচিত তার ভাইকে সাহায্য করা, হোক সে জালেম অথবা মাজলুম। যদি সে জালেম হয়, তাহলে তার উচিত তাকে থামিয়ে দেওয়া কারণ তাকে থামিয়ে দেওয়াই হল তাকে সাহায্য করা। আর যদি সে মাজলুম হয়ে থাকে তাহলে তার উচিত তাকে সাহায্য করা।[6]

এখানে লক্ষ্যণীয়, লোক দুইটি নিজেদের লোকদেরকে অত্যন্ত প্রশংসিত দুইটি শব্দ "মুহাজির" ও "আনসার" ব্যবহার করে ডাক দিয়েছিলেন, তারপরও রাসূল (ﷺ) একে জাহিলিয়াতের ডাক বলেছেন। এর কারণ উপলব্ধি করতে পারলেই আমরা জাহিলিয়াতের ডাক কি তা উপলব্ধি করতে পারব।

ইমাম নববী (র) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ كَرَاهَةٌ مِنْهُ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنَ التَّعَاضُدِ بِالْقَبَائِلِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَمُتَعَلِّقَاتِهَا وَكَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَأْخُذُ حُقُوقَهَا بِالْعَصَبَاتِ وَالْقَبَائِلِ فَجَاءَ الْإِسْلَامُ بِإِبْطَالِ ذَلِكَ وَفَصَلِ الْقَضَايَا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

"রাসূল (ﷺ) এইভাবে আহবান করাকে ঘৃণা ভরে 'জাহিলিয়াতের ডাক' হিসেবে নামকরণ করেছেন **কারণ এই আহবানের উদ্দেশ্য ছিল জাহিলিয়াত উপর ভিত্তি করে দুনিয়াবী বিষয়ে একগুঁয়েভাবে গোত্র বা দলের সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে থাকা আর জাহিলিয়াত হল স্বজনপ্রীতি বা দলাদলির ভিত্তিতে অধিকার সংরক্ষণ করা। ইসলাম এসেছে একে বাতিল করার জন্য এবং শরীয়তী আইনের মাধ্যমে মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করার জন্য।**"[7]

ইমাম নববী (র) এই ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট হল, রাসূল (ﷺ) এসব প্রশংসিত শব্দ দিয়েও আহবান করাকে জাহিলিয়াতের পরিচয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন কারণ এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের তথা ন্যায়বিচারের পরিবর্তে স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে ফায়সালা করা ও সাহায্য সহযোগিতা করা। লক্ষ্য করুন, "হে মুহাজিরেরা" ও "হে আনসারেরা" ব্যবহৃত হয়েছিল; এমনভাবে ডাকা হয়নি যে, "হে মক্কার লোকেরা" বা "হে মদিনার লোকেরা"। লড়াইরত লোকগুলো

---

[5] সহীহ মুসলিম

[6] সহীহ মুসলিম

[7] শরহে মুসলিম

এভাবে অঞ্চলভিত্তিক পরিচয় দিয়ে আহবান না করে, ইসলামে অত্যন্ত প্রশংসিত দুইটি শব্দ দিয়ে আহবান করেছিলেন, যদিও এর উদ্দেশ্য ছিল শরীয়তের পরিবর্তে স্বজনপ্রীতি বা এলাকার উপর ভিত্তি করে সহযোগিতা চাওয়া। আর মুসলিম উম্মতকে দুই টুকরো করা এই পরিচয়কেই রাসূল (ﷺ) জাহিলিয়াতের ডাক বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন এই ধরণের পরিচয়ের মাধ্যমে মুসলিম উম্মতকে বিভক্ত করা অত্যন্ত নিন্দনীয়, দুর্গন্ধযুক্ত কাজ। সাথে সাথে তিনি সহযোগিতার মানদণ্ডও বলে দিয়েছেন – "মানুষের উচিত তার ভাইকে সাহায্য করা হোক সে জালেম অথবা মাজলুম। যদি সে জালেম হয়, তাহলে তার উচিত তাকে থামিয়ে দেওয়া; কারণ তাকে থামিয়ে দেওয়াই হল তাকে সাহায্য করা। আর যদি সে মাজলুম হয়ে থাকে তাহলে তার উচিত তাকে সাহায্য করা।" **আনসার ও মুহাজির ইসলামে অত্যন্ত প্রশংসনীয় পরিভাষা কিন্তু এই পরিভাষাগুলোও যখন মুসলিম উম্মতকে বিভক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হবে তখন সেটাও জাহিলিয়াতের পরিচয় হিসেবে গণ্য হবে। একইভাবে, ইসলাম বাঙালি বা মালয়েশিয়ান বা অন্য জাতি বা গোত্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনা, কিন্তু যখন এগুলো মুসলিম উম্মতের বিভাজনের জন্য ব্যবহৃত হবে তখন এটি জাহিলিয়াতের পরিচয় হিসেবে গণ্য হবে।**

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, তাহলে একবার চিন্তা করুন, আমরা যদি মনে করি বাংলাদেশী মুসলিম নির্যাতিত হলে তাদের সাহায্য করা আমাদের জন্য জরুরী; আর সাথে সাথে এও মনে করি আরাকানি মুসলিম নির্যাতিত হলে সেজন্য এরকম উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই ... বাংলাদেশের মানুষেরা অভাবী ... তাদের নিজেদেরই অনেক সমস্যা ... আরাকানি মুসলিমদের সমস্যা আমাদের সমস্যা নয় ... আরাকানি উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশীদের সাথে মিশিয়ে ফেলা উচিত হবেনা ... তাদের উদ্বাস্তু শিবির হবে বঙ্গোপসাগরের কোন জন-বিচ্ছিন্ন দ্বীপে যেখানে কোন বাংলাদেশী থাকতে পারেনা ... তাহলে বুঝতে হবে আমরাও এই জাহিলিয়াতের পরিচয়কেই লালনপালন করছি; আমরা রাসূল (ﷺ) শেখানো পরিচয় মুমিন, মুসলিম বা আল্লাহর বান্দাকে বর্জন করছি। রাসূল (ﷺ) এর শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা নিচের হাদিসটি সামনে রেখে আরাকানের ভাইদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতাম -

الْمُؤْمِنُونَ تَرَاحُمُهُمْ وَلُطْفُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ كَجَسَدِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، إِذَا اشْتَكَى بَعْضُ جَسَدِهِ أَلِمَ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ

"পরস্পরের প্রতি দয়া বা সদাচরণে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হল একটি মানবদেহ, যখন দেহের কোন একটি অংশ অভিযোগ করে পুরো দেহই ব্যাথা অনুভব করে।"[8]

ইসলামী সমাজের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য

এই বিষয়টির উপরে সুন্দর আলোচনা করেছেন সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র)। চলুন আমরা উনার আলোচনার কিছু মর্মবাণী একবার দেখে নেই। তিনি বলেনঃ

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية، ولإقامة التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها، دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة الحدود الإقليمية السخيفة! ولإبراز " خصائص الإنسان " في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها، دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان. كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع الأجناس والأقوام والألوان واللغات، بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة!

"এই বিষয়ে ইসলামের মানহায বা পদ্ধতি বাস্তব ও উজ্জ্বল ফলাফল দিয়েছে। ইসলাম মানুষের একীভূতকরণের জন্য জাতি ও বর্ণ বা ভাষা ও মাটি বা আঞ্চলিকতার মত নিরর্থক বন্ধনের পরিবর্তে শুধু আক্বীদাকেই ভিত বানিয়েছে। মানুষ এবং পশুর মধ্যে যেই বন্ধনগুলো একই, সেগুলোর পরিবর্তে ইসলাম মানুষের মানবিক বিশেষত্বকে উন্নীত করে সেগুলোকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এই পদ্ধতির বাস্তব ও উজ্জ্বল ফলগুলোর মাঝে অন্যতম ছিল ইসলামী সমাজ, যা একটি মুক্ত সমাজ ছিল, যা সব জাতি ও গোত্রের, ভাষা ও বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমাজে পরিণত হয়েছিল, সেখানে পশুদের বন্ধনের মত কোন নিরর্থক বন্ধনের অস্তিত্ব ছিলনা।"

لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق: العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والأفريقي.. إلى آخر الأقوام والأجناس. وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية. ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوماً ما " عربية " إنما كانت دائماً " إسلامية ". ولم تكن يوماً " قومية " إنما كانت دائماً " عقيدية ".

"এই মহান ইসলামী সমাজে আরব, পারসিক, সিরিয়, মিশরীয়, মরক্কীয়, তুর্কী, চীনা, ভারতীয়, রোমীয়, গ্রীক, ইন্দোনেশিয়ান এবং আফ্রিকান ... এভাবে সব জাতি এবং বর্ণের লোকেরা একত্রিত হয়েছিল। তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয়ের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা গঠনে অংশ নিয়েছিল। এই বিস্ময়কর সভ্যতা একদিনের জন্যও "আরব সভ্যতা" ছিলনা; এটি ছিল সবসময় "ইসলামী সভ্যতা"। এই সভ্যতা কখনও "জাতীয়তাবাদ" এর উপর ছিলনা, এটা সবসময় ছিল আক্বিদার উপর।"

[8] সহীহ ইবনে হিব্বান, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহীহ।

ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة وبآصرة الحب، وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة. فبذلوا جميعهم أقصى كفاياتهم، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم، وصبوا خلاصة تجاربهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعاً على قدم المساواة، وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم الواحد، وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق، وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! ..

"ফলস্বরুপ, তারা সবাই এক সমান ভিত্তি ও ভালবাসার উপর একত্রিত হয়েছিল, তাদের সবার লক্ষ্য ছিল একই; এভাবে তারা সকলে তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্যকে প্রয়োগ করেছিল, নিজ শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিপূর্ণভাবে উন্নীত করেছিল এবং নিজেদের ব্যক্তিগত, জাতীয় ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এই এক সমাজের উন্নয়নের জন্য নিয়ে ঢেলে দিয়েছিল, যে সমাজে তাদের সবার স্থান ছিল একই স্তরে এবং যেখানে সবাই একই বন্ধনে যুক্ত ছিল, যে বন্ধন ছিল তাদের প্রতিপালকের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে। এই সমাজে তাদের মানবতা বাঁধামুক্তভাবে বিকশিত হয়েছিল। আর এই বৈশিষ্ট্য পুরো মানবজাতির ইতিহাসে অন্য কোন মানব সমাজে কখনও পাওয়া যায়নি।"[9]

উম্মত শব্দের পরিচয় ও মুসলিম উম্মতের মর্যাদা

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, জাহিলীয়াতের পরিচয় ও ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করার পরে এখন আপনাদের সামনে মুসলিম উম্মতের মর্যাদা ও মিল্লাতে ইব্রাহীম যা এই উম্মতের যোগসূত্র এবং জাতীয়তা হিসেবে মুসলিম উম্মতের ধারণা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে চাই।

মুসলিম উম্মত এবং মুসলিম সম্প্রদায়

উম্মত (أُمَّة) শব্দের আভিধানিক অর্থ জাতি বা জনগণ। কাজেই, মুসলিম উম্মতের অর্থ দাঁড়ায় মুসলিম জাতি বা মুসলিম জনগণ। উম্মত শব্দের এই অর্থ যে বহুল ব্যবহৃত এবং আধুনিক আরবীতেও এই অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তা বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি। উম্মত (أُمَّة) এর আরবী বহুবচন উমাম (أُمَم) আর জাতিসংঘের আরবী হল উমামুল মুত্তাহিদাহ (الأُمَم المتحدة)। বৈশ্বিক কুফরি শক্তি এই প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী সব জাতিগুলোকে একত্রিত করার জন্য। এই শক্তি মুসলিম উম্মত বা মুসলিম জাতিকে আজ আঞ্চলিকতার উপর ভিত্তি করে শত শত ভাগে বিভক্ত করে, সেগুলোকেই প্রকৃত জাতীয়তা বানিয়ে, তাঁদের আসল জাতীয়তা যে ইসলাম, সেটাই ভুলিয়ে দিয়েছে।

মুসলিম উম্মতের প্রতিশব্দ হিসেবে মুসলিম জাতি শব্দটির ব্যবহার এখন প্রায় অপ্রচলিত। যে শব্দটি এখন বহুল ব্যবহৃত হয় তা হল মুসলিম সম্প্রদায়। সম্প্রদায় শব্দটি একটি বহুল অর্থবোধক শব্দ। বাংলা একাডেমীর অভিধানে যেমন এর অর্থ দেওয়া হয়েছে সমাজ, গোষ্ঠী, দল, সংঘ, এক মতের লোক। এ অর্থগুলো থেকে সমাজ বা এক মতের লোক অর্থ দুইটি গ্রহণযোগ্য; আর বাকি অর্থগুলো মুসলিম উম্মতের জন্য শোভনীয় নয়, কারণ এগুলো উম্মতের ধারণাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে।

কিন্তু সমস্যা হল আমাদের কথায় বা লেখনীতে "মুসলিম সম্প্রদায়" শব্দটি অনেক সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার", "সবার উপরে দেশ" ইত্যাদি ধর্মহীন, জাতীয়তাবাদী উগ্র শ্লোগানের প্রচার-প্রোপাগান্ডায় মুসলিম সম্প্রদায়ের স্থান শুধুমাত্র রাষ্ট্রের অধীনে এক গোষ্ঠীর উপরে কিছু মনে হয়না। এগুলো আরও সুস্পষ্ট হয়, যখন এসব বাস্তবতা আমাদের সামনে উপস্থিত হয় - রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা ... সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (ﷺ) এর অবমাননার জন্য কোন আইন প্রয়োগ হয়না কিন্তু ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু কামনার জন্য সাত বছরের কারাদণ্ড হয় ... আইনের উৎস হয় ইউরোপীয় জলদস্যুদের বানানো আইনব্যবস্থা ... রাষ্ট্র যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার ভিত্তি হয় ভূখণ্ড, ভাষা, গোত্র বা বর্ণভিত্তিক জাতীয়তা; মানুষের মানবীয় গুণ তথা ইসলামী আক্বীদাকে ভিত্তি করে নয়।

কাজেই, "মুসলিম সম্প্রদায়" এরকম অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার না করে, যদি আমরা "মুসলিম উম্মত" অথবা "মুসলিম জাতি" শব্দটি আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং দ্বীনি কথাবার্তায় বা লেখনীতে ব্যবহার করি, তাহলে সেটা মুসলমানদের মাঝে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করবে; আর আমরা নিজেরাও অন্য ভাষা বা অঞ্চলের কিংবা গোত্র বা বর্ণের মুসলিম ভাইদেরকেও আমাদের স্বজাতি হিসেবে অনুভব করতে শুরু করব।

মুসলিম উম্মতের মর্যাদা ও মিল্লাতে ইব্রাহীম

মুসলিম উম্মত বা মুসলিম জাতি এই পরিচয়েই যে একজন মুসলমানের নিজেকে পরিচয় দেওয়া উচিত এবং সত্য ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত – এটা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এ পর্যন্ত আমার লক্ষ্য। এখন যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে চাই, তাহল মুসলিম উম্মতের মর্যাদা কি বা কতটুকু এবং এই উম্মত বা জাতির মানুষদের মাঝে পারস্পরিক যোগসূত্র "মিল্লাতে ইব্রাহীম" সম্পর্কে।

---

[9] نَشأَة المجتَمع المسْلِم وَخَصَائِصُه-معالم في الطريق (Milestone - Characteristics of Islamic Society)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন মাজিদে বলেনঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী বা ওয়াসাত জাতি করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।"[10]

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবনে কাসির বলেনঃ

يقول تعالى : إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم ، عليه السلام ، واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم ، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم ; لأن الجميع معترفون لكم بالفضل . والوسط هاهنا : الخيار والأجود ، كما يقال : قريش أوسط العرب نسبا ودارا ، أي : خيرها . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه ، أي : أشرفهم نسبا ... ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب ، كما قال تعالى : (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس) [الحج : 78]

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم . فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد . فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته " قال : فذلك قوله : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا).

قال : الوسط : العدل ، فتدعون ، فتشهدون له بالبلاغ ، ثم أشهد عليكم.

رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش ، [به].

"আল্লাহ বলছেন যে, তিনি আমাদের কিবলা ইব্রাহীম (আঃ) এর কিবলার দিকে পরিবর্তন করেছেন এবং আমাদের জন্য এটি পছন্দ করেছেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বা জাতিতে পরিণত করতে পারেন, অন্য উম্মত বা জাতির জন্য তোমরা সাক্ষী হতে পার। কেননা, তাদের সবাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে একমত। এই আয়াতে 'ওয়াসাত' (وَسَطًا) শব্দটির অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে উদার; যেমনটি বলা হয়ে থাকে কুরাইশ আরব গোত্রগুলোর এবং তাদের এলাকাগুলোর মাঝে 'ওয়াসাত', অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন তাঁর জাতির মাঝে 'ওয়াসাত' অর্থাৎ তিনি বংশগত দিক থেকে তাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ... আল্লাহ এই উম্মত (মুসলিম জাতি) কে 'ওয়াসাত' বানিয়েছেন; **এর বৈশিষ্ট্যগুলো হল এর সবচেয়ে পরিপূর্ণ বিধান অর্থাৎ শরীয়ত, সবচেয়ে সরল পথ ও পন্থা এবং সবচেয়ে সুস্পষ্ট মতাদর্শ।** যেমনটা তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ

"তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। **(এটিই) তোমাদের পিতা, ইব্রাহীম (আঃ) দ্বীন বা মতাদর্শ (কাজেই এর উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত থাক)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান পূর্বেও এবং এই কোরআনেও**, যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা হয় এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলির জন্যে"। (সূরা হাজ্জঃ ৭৮)

অধিকন্তু, ইমাম আহমাদ এই আয়াতের তাফসিরে, রাসূল (ﷺ) এর একটি হাদিস বর্ণনা করেন যেখানে তিনি (ﷺ) বলেনঃ 'ওয়াসাত' এর অর্থ হল ন্যায়পরায়ণ। তোমাদেরকে আল্লাহর আদালতে আহবান করা হবে এরপর তোমরা সাক্ষ্য দিবে যে, নূহ (আঃ) তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়েছিলেন আর আমি তোমাদের সাক্ষ্যকে সত্যায়িত করব।

একই বর্ণনা বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ থেকেও বিবৃত হয়েছে।"[11]

উপরে বর্ণিত সূরা হাজ্জের ৭৮ নং আয়াতের তাফসির থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ নিজেই এই ন্যায়পরায়ণ জাতির নাম রেখেছেন মুসলিম এবং এই নাম শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য নয় বরং এর পূর্ব থেকেই; আর ন্যায়পরায়ণ এই জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ), যিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান এবং আরব ও এর আশপাশের মুশরিকরাও সর্বসম্মতিতে একজন মহান নবী হিসেবে স্বীকার করে। এই আয়াতে আমাদেরকে জাতির পিতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁরই অনুসরণ করার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতৃসুলভ দু'আ কুরআনে আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করছেনঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

[10] সূরা আল-বাকারাহঃ ১৪৩

[11] তাফসিরে ইবনে কাসির সূরা আল-বাকারাহঃ ১৪৩, শিরোনাম- উম্মতে মুহাম্মাদীর গুণাগুণ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার প্রতি মুসলিম (আজ্ঞাবহ) এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি মুসলিম (অনুগত) জাতি বানিয়ে দাও।"[12]

আল্লাহ আরও বলেনঃ

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

"মানুষদের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম।"[13]

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবনে কাসির বলেনঃ

يقول تعالى : أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه ، وهذا النبي - يعني محمدا صلى الله عليه وسلم - والذين آمنوا من صحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم.

قال سعيد بن منصور : أخبرنا أبو الأحوص ، عن سعيد بن مسروق ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن لكل نبي ولاة من النبيين ، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل " . ثم قرأ : (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه [وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين])

আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ ইব্রাহীমের অনুসারী হওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার তাদের, যারা তাঁর দ্বীনের অনুসারী এবং এই নবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর মুহাজির এবং আনসার সাহাবীরা এবং যারা তাঁদের নীতির অনুসরণ করে।

ইবনে মাসউদ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "প্রত্যেক নবীর আম্বিয়াদের মধ্য থেকে একজন ওয়ালী (ঘনিষ্ঠতম বন্ধু) থাকে। আম্বিয়াদের মধ্য থেকে আমার ওয়ালী আমার পিতা, আমার মহান প্রতিপালকের খলিল, ইব্রাহীম।" এরপর নবী (ﷺ) তিলাওয়াত করেনঃ "মানুষদের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম ..."[14]

কুরআন মাজীদের আরও বেশ কিছু আয়াতে আল্লাহ রাসূল (ﷺ) কে একনিষ্ঠভাবে আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর আদর্শেরই অনুসরণ করতে বলেছেন। যেমনঃ

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

"ইব্রাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায় সে ব্যক্তি ছাড়া, যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।"[15]

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইব্রাহীমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"[16]

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আপনি বলে দিনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন একাগ্রচিত্ত ইব্রাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"[17]

আল্লাহর এই বাণীগুলো থেকে বোঝা যায়, ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদী, খৃষ্টান বা মুশরিক ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন মুসলিম, আল্লাহর একত্ববাদের অনুসারী, তাঁর আদর্শ ছিল তাওহীদ; আরব, ইহুদী বা সেমিটিক কোন আদর্শের উদ্ভাবক তিনি ছিলেননা। সাথে সাথে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম জাতি হল আল্লাহর নির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ জাতি, এই জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ); এই জাতি তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করে তাওহীদ অর্থাৎ একত্ববাদের চর্চা করে এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

12 বিস্তারিত দেখুন তাফসিরে কুরতুবি সূরা হাজ্জঃ ৭৮।
13 সূরা আলে ইমরানঃ ৬৮
14 তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা আলে ইমরানঃ ৬৫-৬৮, শিরোনাম – ইব্রাহীমের দ্বীনের ব্যাপারে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বিবাদ
15 সূরা আল-বাকারাহঃ১৩০
16 সূরা আল-বাকারাহঃ১৩৫
17 সূরা আল-আন'আমঃ১৬১

বাংলাদেশের মুসলমানদের আরাকানী মুসলমানদের জন্য করণীয়

ভৌগলিক প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে আরাকানের মুসলমানদের অধিকার অনস্বীকার্য। আবার এটাও লক্ষ্যণীয় যে, ভৌগলিক অবস্থার বিবেচনায় চট্টগ্রাম আরাকানের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং বাংলাদেশের মাঝে চট্টগ্রামের মানুষের চালচলন ও সংস্কৃতির সাথে আরাকানের মুসলমানদের রয়েছে বহু মিল। সেজন্য করণীয় নিয়ে আলোচনা করার আগে, দুইটি বিষয় নিয়ে সামনে নিয়ে আসা জরুরী মনে করছি; তাহল বাংলার ভূমিতে ইসলাম প্রচারে চট্রগ্রামের অবদান এবং আরাকান ও চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বন্ধন। এই বন্ধন আমাদের সামনে থাকলে, আমরা এটাও বুঝতে পারব অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকেরা কিভাবে মুসলিম উম্মতকে আলাদা আলাদা দেশে বিভক্ত করে অত্যাচারের নিশানা বানিয়েছে।

চট্টগ্রামে ইসলাম এবং আরাকান ও চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বন্ধন

এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, বাংলায় আরবদের আগমন ঘটে চট্টগ্রামের মাধ্যমে আর সেই সুবাদে বাংলায় ইসলামের দাওয়াতও প্রথম পৌঁছে চট্টগ্রামের পথ ধরেই খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। আরব বণিকেরা চট্টগ্রামে কোন রাজ্যগঠন না করলেও আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব এখনও পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা ভাষাতেও প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, আরবী শব্দ شَطّ অর্থাৎ তীর এবং গঙ্গা থেকে আরবরা এই এলাকার নাম রাখে "শাত আল-গঙ্গা", যা কালের বিবর্তনে চাটগাঁও এবং পরে চট্টগ্রাম নাম ধারণ করে।[18]

অষ্টম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রামে মুসলমানরা বসবাস শুরু করে, সেই সময় তাদের কাজ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচার। তাদের এই কার্যক্রমের ফলে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে দ্রুত ইসলাম প্রসারিত হয়। এজন্য বাংলায় চট্টগ্রামকে "বার আউলিয়ার দেশ"ও বলা হয়ে থাকে। অবশেষে ঢাকার কাছেই অবস্থিত সোনার গাঁয়ের স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ১৩৪০ সালে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করে তা মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর উসমানীয় খলিফারাও নিজেদের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজ মেরামতের কারখানা ব্যবহার করে।[19]

এবার আসি আরাকান প্রসঙ্গে। আরাকান পর্বতমালা আরাকান রাজ্যকে বার্মার মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করে রেখেছে। ফলে ভৌগলিকভাবে বার্মা থেকে চট্টগ্রাম আরাকানের অধিক নিকটবর্তী। মুসলমান ছাড়া অন্য যে জনগোষ্ঠী এখানে মূলত বসবাস করে তারা হল রাখাইন। এই জনগোষ্ঠী মার্মা ও মগ নামেও পরিচিত। ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত কখনই আরাকান বার্মার মূল ভূখণ্ডের মানুষের দ্বারা শাসিত হয়নি। আরব ব্যবসায়ীদের দ্বীনপ্রচারের সুবাদে চট্টগ্রামের মত আরাকানেও ইসলামের প্রচারিত হয়। কখনও এর অধিবাসীরা তাদের রাজ্যসীমা চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। আবার কখনও কখনও বাংলার সুলতানেরাও আরাকানকে আলাদা প্রদেশ হিসেবে শাসন করেছে। ১৪৩৩ সালে রাজা গণেশের পুত্র, ধর্মান্তরিত মুসলিম, সুশাসক সুলতান জালালউদ্দিন মুহাম্মাদ শাহের মৃত্যুর পরে আরাকান বাংলার সালতানাত থেকে আলাদা হয়ে যায়। শুধু তাই নয় ১৪৫৯ সালে আরাকান রাজা চট্টগ্রাম দখল করে, ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম তাদের দখলে ছিল।

বাংলার সালতানাত থেকে আলাদা হওয়ার পরও আরাকানের রাজারা মুসলিম সুলতানদের লকবগুলো ধরে রাখে এবং ইসলামী বাংলার মুদ্রা তাদের রাজ্যে চালু রাখে।[20] বৌদ্ধ রাজারা নিজেদেরকে সুলতানদের সাথে তুলনা করতেন এবং মুঘল শাসকদের মত বেশভূষা ব্যবহার করতেন। তারা তাদের প্রশাসনে অনেক সম্মানজনক পদে মুসলমানদের নিয়োগ দিতে থাকে।[21] সপ্তদশ শতাব্দীতে কর্মসংস্থানের সুবাদে আরাকানে মুসলিম জনবসতি অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যায়; এসময় তাদের অনেকে আদালতে বাংলা, ফার্সি ও আরবী দলিল দস্তাবেতের লেখালেখির কাজ করত। এরপর ১৬৬৬ সালে ন্যায়পরায়ণ শাসক, সম্রাট আলমগিরের শাসনামলে বাংলার সুবেদার, শায়েস্তা খান রাখাইন তথা মগদের লুণ্ঠন ও জলদস্যুতা বন্ধ করার জন্য চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন এবং চট্টগ্রামের নাম রাখেন '**ইসলামাবাদ**'।

যেসব মুসলমানেরা আরাকানে দীর্ঘদিন থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছিল, তারা নিজেদের রোহিঙ্গা বলে পরিচয় দিতে শুরু করে।[22] রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বার্মিজ ভাষায় কথা বলেনা, বরং তারা যে ভাষায় কথা বলে তা বাংলা-অসমীয়া ভাষা থেকে উদ্ভূত এক ভাষা যা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা ভাষার কথ্যরূপের সাথে মিলে।[23]

আরাকানে প্রথম গণহারে মুসলিম নিধন শুরু হয় ১৭৮৫ সালে, যখন বার্মা কর্তৃক আরাকান বিজিত হয়। বার্মিজদের হত্যা নির্যাতন এড়াতে প্রায় ৩৫,০০০ আরাকানি চট্টগ্রামে পালিয়ে আসে। বার্মার শাসকেরা হাজার হাজার আরাকানি মানুষ হত্যা করে এবং অনেক বড় সংখ্যায় মানুষ বার্মার কেন্দ্রে স্থানান্তরিত

---

18 East Bengal District Gazetteer, Chittagong District - Bernavilli, p.1.

19 http://www.salahuddinkasemkhan.com/hcg/index.html

20 Yegar 2002, p 23-24.

21 Yegar 2002, p 24.

22 Burma Empire by Francis Buchanan-Hamilton, Vol 5, p - 219-240, written in 1799 .

23 Language and National Identity in Asia by Andrew Simpson, p 267.

হয়; ফলে আরাকানের জনবসতি অনেক কম হয়ে যায়।[24] এরপর ১৮২৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আরাকান দখল করে আরাকানকে বাংলার সাথে মিলিয়ে এক প্রদেশ হিসেবে শাসন করতে থাকে। ফলে বাংলা ও আরাকানের মাঝে কোন আন্তর্জাতিক সীমারেখা ছিলনা এবং বাংলা থেকে আরাকান বা আরাকান থেকে বাংলায় এসে বসবাসে কোন বাঁধা ছিলনা।[25]

১৮৮৬ সালে সমগ্র বার্মা ব্রিটিশদের অধীনে আসে। কালক্রমে বার্মাকে আলাদা প্রদেশ বানানো হয় এবং আরাকানকে বার্মার সাথে মিলিয়ে দিয়ে, বাংলা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালে বার্মাকে ভারত থেকে পুরোপুরি আলাদা উপনিবেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এভাবেই, আরাকান বার্মার সাথে মিলে যায় এবং চট্টগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার সময় আরাকানের মুসলিম নেতারা আরাকানকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করার দাবি জানালেও, মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ তাদের এই অনুরোধকে এই বলে উপেক্ষা করেন যে, এটা বার্মার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।[26]

ফলস্বরূপ, ১৯৪৭ সালে আরাকানের মুসলিমরা স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের লক্ষ্যে উত্তর আরাকানে জিহাদী আন্দোলন শুরু করেন।[27] পঞ্চাশের দশকে তারা স্বতন্ত্র পরিচয়কে তুলে ধরার জন্য এবং আরাকানের উপর নিজেদের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য "রোহিঙ্গা" শব্দটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু করেন। এর আগে "রোহিঙ্গা" শব্দ এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিলনা। ব্রিটেন ১৯৪৮ সালে বার্মাকে স্বাধীনতা দেয়; কিন্তু তখন থেকেই এখানকার রাখাইনরাও আরাকানের বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন শুরু করে। ফলে একদিকে মুসলিম অন্যদিকে রাখাইন দুই জনগোষ্ঠীই আরাকানের বিচ্ছিন্নতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যায়। ষাটের দশক থেকে আরাকানি মুসলমানদের উপর বার্মিজ সামরিক জান্তা হত্যা নির্যাতন শুরু করে। বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনকে প্রশমিত করতে ১৯৭৪ সালে আরাকান প্রদেশের নাম পরিবর্তন করে রাখাইন রাখা হয়, যার মাধ্যমে কার্যত আরাকানকে শুধু বৌদ্ধ রাখাইনদের আবাস হিসেবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয় আর মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। চলতে থাকে ধারাবাহিক দমন নিপীড়ন; ১৯৭৮ সালে "Operation King Dragon" এর সময়, অনেক বড় সংখ্যায় আরাকানি মুসলিম বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং পাকিস্তানের করাচিতে স্থানান্তরিত হয়।[28]

২০১২ সালের দাঙ্গার সময়ের জরীপ মোতাবেক, আরাকানের মোট জনসংখ্যার ৪০.৭৫% রোহিঙ্গা মুসলিম, যদিও হত্যা নির্যাতনের কারণে ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলমানই এখন আরাকানের বাইরে বাস করে। যদি এই বিপুল সংখ্যক বাস্তুহারা রোহিঙ্গাকে আরাকানের জনসংখ্যা থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে রোহিঙ্গা মুসলিম হবে আরাকানের মোট জনসংখ্যার ২০%। এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তর আরাকান বিশেষভাবে চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় এলাকা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এসব এলাকার ৯৬% জনগণই মুসলমান; এবং অত্যাচারী বার্মিজ আইন তাদের পরিবার প্রতি দুই সন্তান নীতিতে সীমাবদ্ধ রেখেছে।[29]

মুসলিম ভাই হিসেবে আমাদের করণীয়

যখন আমাদের সামনে এটা পরিষ্কার হবে যে, আরাকানের এই মুসলিম ভাই-বোনেরা আমাদের স্বজাতি; তারা আমাদের মুসলিম ভাই ও বোন; তখন আমরা অবশ্যই তাদের ব্যাথায় আমরা ব্যাথিত হব এবং তাদের জন্য কি করণীয় তা নিয়ে চিন্তা করব।

কাজেই প্রশ্ন হলঃ কি করা উচিত? আমার বিশ্বাসঃ

সবচেয়ে প্রথমেই আমাদের জন্য যা করণীয় তা হল জাতি গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে সব মুসলমানদের এক করে দেখা, পারস্পরিক বন্ধনকে মজবুত করা। আমদের অবশ্যই একে অন্যের বিশ্বস্ত বন্ধু হতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

"আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে"[30]।

যখন আমাদের মাঝে আল্লাহর দেওয়া এই জাতীয়তা বা এই পরিচিতি পরিষ্কার, তখন তাদের সমস্যাকে আমরা আমাদের নিজেদের সমস্যা মনে করব। তাদেরকে কোন জঙ্গল বা বঙ্গোপসাগরের কোন দ্বীপে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাববনা। তাদের জন্য লড়াই করা বা তাদের জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া আমাদের কাছে কঠিন কিছু মনে হবেনা। বাঙালি মুসলমানেরা ১৯৭১ সালে মুরতাদ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল বাঙালি মুসলমানদের উপর জুলমকে প্রতিহত করার জন্য; তাহলে তাদের জন্য আরাকানি মুসলমানদের জুলমকে প্রতিহত করার জন্য সুস্পষ্ট কাফের বার্মিজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে

---

24 Aye Chan 2005, p. 398-399

25 Aye Chan 2005, p. 403

26 Yegar 1972, p 10

27 Bilveer Singh (2007). The Talibanization of Southeast Asia: Losing the War on Terror to Islamist Extremists. p. 42.

28 Derek Henry Flood (31 December 1969). "From South to South: Refugees as Migrants: The Rohingya in Pakistan". Huffington Post. Retrieved 11 February 2015.

29 "Unforgiving history". The Economist. 3 November 2012

30 সূরা আল-আনফালঃ৭৩

লড়াই কি খুব কঠিন কিছু?!! হ্যাঁ, বস্তুবাদী হিসাব নিকাশ করলে কিছুটা কঠিন বটে, কারণ ১৯৭১ সালে ভারত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সহযোগিতা করেছিল এবং এখন পর্যন্ত সেই সহযোগিতার ফায়দা তারা উঠাচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের আসল জাতীয়তার জন্য লড়াই করি, যেই জাতীয়তা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, আল্লাহ, আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, তাঁর উপরই ভরসা করি তাহলে আমাদের জন্য তিনি যথেষ্ট হবেন। লক্ষ্য করুন, কিভাবে তিনি আমাদের সাহস দিচ্ছেন –

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন।[31]

তিনি আরও বলেনঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ

আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে আর অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না।[32]

আরাকানে মুসলিম জনবসতির উপর যে অবর্ণনীয় জুলম নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ, নারী নির্যাতন, জ্বালাও পোড়াও চলছে, তার কারণে বার্মার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন। জিহাদ কখন ফরযে আইন হয়, সেই বিষয়ে উপলব্ধির জন্য পাঠকদের শহীদ আবদুল্লাহ আযযাম (র) এর "মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা" বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ করব।

হানাফি মাযহাবের ফিকহের বিখ্যাত বই, 'রাদ্দুল মুহতার' এ, ইবনে আবিদীন (র) বলেনঃ

إنْ هَجَمُوا عَلَى ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ الْإِسْلَامِ، فَيَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ، وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجِهَادِ وَنَقَلَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ أَنَّ الْجِهَادَ إذَا جَاءَ النَّفِيرُ إنَّمَا يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى مَنْ يَقْرُبُ مِنْ الْعَدُوِّ، فَأَمَّا مَنْ وَرَاءَهُمْ بِبُعْدٍ مِنْ الْعَدُوِّ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَسَعُهُمْ تَرْكُهُ إذَا لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِمْ فَإِنْ احْتِيجَ إلَيْهِمْ بِأَنْ عَجَزَ مَنْ كَانَ يَقْرُبُ مِنْ الْعَدُوِّ عَنْ الْمُقَاوَمَةِ مَعَ الْعَدُوِّ أَوْ لَمْ يَعْجِزُوا عَنْهَا، لَكِنَّهُمْ تَكَاسَلُوا وَلَمْ يُجَاهِدُوا فَإِنَّهُ يُفْتَرَضُ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ فَرْضَ عَيْنٍ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، لَا يَسَعُهُمْ تَرْكُهُ ثُمَّ وَثُمَّ إلَى أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ شَرْقًا وَغَرْبًا

অর্থাৎ যদি শত্রুরা মুসলিমদের কোন ভূখণ্ডের সীমানায় হামলা করে, তাহলে ঐ ভূখণ্ডের নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শত্রুর মোকাবেলার সক্ষমতা রাখে, ততক্ষণ শুধু তাদের উপরই জিহাদ ফরযে আইন থাকে। যারা দূরবর্তী জায়গায় থাকে, তাদের সাহায্য জরুরী না হলে, তাদের জন্য জিহাদ ফরযে কিফায়া অর্থাৎ জরুরী না হলে তাদের জন্য জিহাদ না করা জায়েজ। আর যদি তাদের সাহায্য জরুরী হয়, কারণ যারা নিকটবর্তী তারা শত্রুর মোকাবেলা করতে অক্ষম অথবা অলসতা দেখায় এবং জিহাদ থেকে দূরে থাকে; তাহলে, এটা এই নিকটবর্তীদের পরে যারা আছে, তাদের উপর সেভাবেই ফরযে আইন হয়ে যায় যেভাবে নামায ও রোযা ফরযে আইন। এটা পরিত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। এরপর এরাও যদি অপারগ হয়, তাহলে এদের পরে যারা আছে তাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় এবং একইভাবে তাদের পরে; এভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো মুসলিম উম্মতের উপর ফরযে আইন হয়ে যায়।[33]

ইবনে আবিদীন (র) এর কথার দিকে তাকালে আমরা সহজেই বুঝব, অন্য যে কোন মুসলমানদের থেকে বাংলাদেশের মুসলমানদের আরাকানের মুসলমানদের প্রতি দায়িত্ব বেশি। আমাদের, বাংলাদেশের মুসলমানদের, কাছে আছে ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা। আমরা ভালভাবে জানি কিভাবে গেরিলা যুদ্ধ করতে হয়। সবার পক্ষে তো সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু আমাদের যার যা সামর্থ্য আছে, তার উচিত সেই সামর্থ্য নিয়েই এই জিহাদে অংশ নেওয়া। 'জিহাদ বিল মাল' অর্থাৎ অর্থের মাধ্যমে আমাদের কেউ কেউ জিহাদে অংশ নিতে পারেন; বৃদ্ধ বাবা-মা থেকে শুরু করে ঘরের গৃহিণী পর্যন্ত সবাই কোন না কোনভাবে জিহাদের আনসার হিসেবে কাজ করতে পারেন। বিশেষভাবে, চট্টগ্রামের মুসলমানদের জন্য আরাকানি মুসলমানদের ঘরে জায়গা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ; কারণ, তাদের মাঝে ভাষাগত কোন প্রতিবন্ধকতা নেই এবং আরাকানি মুসলমানদেরকে তারা সহজেই নিজেদের ঘরের মানুষ হিসেবে দেখিয়ে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহর উপর ভরসা করে এই পথে নামলে, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছাই পথ খুলে দিবেন।

পরিশেষ

প্রবন্ধের শেষে আমার এই লেখনীর উদ্দেশ্য ও আহবানকে সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই –

---

31 সূরা আল-তালাকঃ৩

32 সূরা আল-বাকারাহঃ ১৯০

33 'রাদ্দুল মুহতার আলা দারিল মুখতার', কিতাবুল জিহাদ, চতুর্থ খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা

- আমাদের জাতীয়তা মুসলিম এবং এই জাতীয়তাই অন্য সব পরিচয়ের উপরে প্রাধান্য পাবে। অন্য কোন পরিচয়কে এই পরিচিতির উপর প্রাধান্য দিলে সেটি হবে জাহিলিয়াতের পরিচয়।
- আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আ), যার আদর্শ - শুধু আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে একত্ববাদের চর্চা। এই আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমেই একজন মানুষ এই জাতির মাঝে শামিল হয়ে যায়। এই জাতির সদস্য হওয়ার জন্য মানুষকে নিজের সাধ্যের মধ্যে নেই এমন কিছুর উপর নির্ভর করতে হয়না।
- আদর্শ মুসলিম সমাজ সব জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটি সমাজ, যেখানে সম্মানের মাপকাঠি শুধুমাত্র তাকওয়া তথা দ্বীনদারিতা।
- আরাকান প্রকৃতপক্ষে বার্মার কোন অংশ নয়, এটি ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে বার্মা থেকে বিচ্ছিন্ন। একে বার্মার সাথে মিলিয়ে মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছিল কাফেরদের মুসলমান নিধনের পূর্ব পরিকল্পনার অংশ।
- বাঙালি একজন মুসলমানকে রক্ষা করা আমাদের উপর যেমন দায়িত্ব; আরাকানের মুসলিমদের রক্ষা ও সাহায্য করাও আমাদের উপর তেমনই দায়িত্ব।
- যারা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জুলমকে বন্ধ করার জন্য লড়াই করতে পেরেছিল, তারা একইভাবে বার্মিজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

আর আমাদের সর্বশেষ কথা হল – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আপনাদের একনিষ্ঠ দু'আয় আমাদেরকে ভুলবেননা।

